উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ বিপর্যয়ে সাহায্যের আবেদন!

উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টি ও প্লাবনের কারণে পর্যটক ও তীর্থক্ষেত্র ছাড়াও সেখানকার কয়েক হাজার গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা সেই গ্রামগুলিতে আমাদের সীমিত সামর্থ্যের মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে চাইছি। যোগাযোগ : শমীক (০৩৩-২৪১৪৭৭৩০), জিতেন (০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬), রামজীবন (০৩৫৮২-২৫৮৩৪৬))

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন

Vol 5 Issue 2 16 July 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৬ জুলাই ২০১৩ মঙ্গলবার ২ টাকা

•জৈবপ্রযুক্তি নীতি পৃ ২ •লেক ভেঙেই পৃ ২ •মেগাসিটি পৃ ৩ •গণধোলাই পৃ ৩ •মাছের রাজ্যে পৃ ৩ •শবে বরাত পৃ ৪ •ব্রতচারী পৃ ৪ •মিশর পৃ ৪

বিপর্যস্ত গ্রাম উত্তরাখণ্ডের দীর্ঘমেয়াদী পুনর্গঠনের ডাক

তিলক সোনির ফেসবুক পেজ এ পাওয়া ছবিতে উত্তরাখণ্ডের ওঙ্গি গ্রামের এক ১০০ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা বর্ণনা করছেন, তাঁর জীবৎকালে এতবড়ো প্লাবন দেখেননি।

মনোজ পাণ্ডে, হিমালয় সেবা সঙ্ঘ, উত্তরকাশী, ১২ জুলাই •

উত্তরাখণ্ডে প্রতি বছরই ভূমিধসে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে। অন্যান্য বছর শ্রমিকরা মারা যায়, গ্রামবাসী মারা যায়, তাই খবর হয় না। কিন্তু এবার প্রচুর তীর্থযাত্রী মারা গেছে, যারা মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। তাই জন্য চারদিকে শোরগোল পড়ে গেছে।

ত্রাণের কাজের মধ্যেই পড়ে উদ্ধারকার্য। সেটা চলছে। সেনাবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী এবং গ্রামবাসীদের সহায়তায় এই কাজটি চলছে, প্রায় শেষও হয়ে এসেছে। এখন চলছে আশু ত্রাণের কাজ। তাতে ওষুধপত্র এবং মূলত স্বাস্থ্যকর্মী লাগছে। তাই এখন যারা একটু দূরে (যেমন পশ্চিমবঙ্গে) ত্রাণ সংগ্রহ করছে উত্তরাখণ্ডের মানুষদের জন্য, তারা টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে পারেন কেবলমাত্র। কারণ এতদূর থেকে অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী এখানে আনা ও বিতরণ করা খরচসাপেক্ষ। তাছাড়া এখনও বহু গ্রামেই কোনো গাড়ি যাচ্ছে না। ফলে ত্রাণ পাঠানোও যাচ্ছে না।

আমরা হিমালয় সেবা সংঘ-র তরফে একটি বা দুটি গ্রামে দীর্ঘমেয়াদী পুনর্গঠনের কাজ হাতে নিতে চলেছি। যেভাবে ভূমিধস নেমেছে, তাতে সেই ধস পরিষ্কার করা, আবার যাতে ধস না নামে তার জন্য ঝোপ জাতীয় গাছ লাগানো (কারণ বড়ো গাছ ভূমিধস আটকাতে পারে না) প্রভৃতি কাজ।

এছাড়া যেসব বাড়ি ভেঙে পড়েছে, সেখানে ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেগুলির পুনর্গঠন করা দরকার। কংক্রিটের বাড়ির কারণে ভূমিধসের ফলে মানুষের মৃত্যু ও দুর্ভোগ বেশি হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতেও এইরকম দুর্যোগ হতে পারে। আমি দার্জিলিং বা তার আশেপাশে দেখেছি, এই ধরনের ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

এছাড়া দীর্ঘমেয়াদীভাবে সরকারের নীতিগত কিছু দিকের বিরুদ্ধেও আমরা জনমত গড়ে তুলব, সেটা এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অঙ্গ। যেমন, প্রথমত নদীতে বাঁধ নির্মাণ; দ্বিতীয়ত বড়ো বড়ো কংক্রিটের বাড়ি নির্মাণ; তৃতীয়ত ধর্মীয় ট্যুরিজম। ধর্মীয় ট্যুরিজমে আসে মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত ট্যুরিস্টরা। স্থানীয় মানুষেরা তাদের খিদমৎ খাটে মাত্র। ট্যুরিস্টদের থাকা খাওয়া প্রভৃতি নিয়ে ব্যবসা করে চলে যায় বাইরের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা। আর এই ধরনের ধর্মীয় পর্যটনের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদীদেরও বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। এগুলোও আমাদের প্রচারসূচিতে থাকবে।

আপনারা যদি আমাদের এই দীর্ঘমেয়াদী পুনর্গঠন প্রকল্পে অংশীদার হন, তাহলে আমরা খুবই খুশি হব।

কৃষি পশুপালন থেকে সরে আসা উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ের কারণ

রুনা, হিমাচল প্রদেশ, ১৩ জুলাই •

আজ ১ জুলাইয়ের সংবাদমন্থন হাতে পেলাম। বর্তমানের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে যা লেখা আছে পড়লাম। মনে হল, দু-একটা কথা বলার আছে, তাই লিখছি।

পাহাড় ভাঙা বানের কারণ শুধুই পর্যটন বা বাড়িঘর বানানো নয়, আঞ্চলিক মানুষের ব্যবহারিক জীবনেও পরিবর্তন হয়েছে। পশুপালন আর কৃষিভিত্তিক জীবন থেকে সরে গিয়ে চটজলদি বড়োলোক হতে চাইছে এক শ্রেণী আর আরেক দল খেটে মরছে, সময় সময় ঘরের প্রয়োজনটাও মেটাতে পারে না চাষ বা পশুপালন করে। স্থানীয় লোক জমি বেচে বা ঘরে তালা লাগিয়ে শহরে চলে যাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে যত ঘরে তালা লাগানো গ্রাম পাওয়া যায় তা হিমাচলে নেই।

শুধুই কি পাহাড়, যে কোনো অঞ্চলের চরিত্রকে ধরে রাখার জন্যে ঘরের লোক দরকার। হিমাচলে তা আছে, কিন্তু উত্তরাখণ্ডে তা বেশ কম। সরকারি নিয়মকানুন কিছু অংশে সাধারণের চরিত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হিমাচলে পর্যটন আছে, জমিও অন্যের হাতে যাচ্ছে; কিন্তু কৃষি-পশুপালন টিকে থাকার ফলে জমি আগ্রাসনের মাত্রা কম। আজও বেশিরভাগের প্রধান আয় স্বাধীন কায়িক শ্রম, কৃষি ও পশুপালন।

আমার মনে হয়, আমাদের মতো নদীমাতৃক দেশে কৃষি ও পশুপালন থেকে সরে আসা প্রাকৃতিক তথা সামাজিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

ভালো থেকো সবাই।

আমৃত্যু পরমাণু বিরোধী লড়াইয়ের শপথ ইদিনথাকারাইয়ে

অ্যাটমিক এনার্জি নিয়ন্ত্রক সংস্থা, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক, তামিলনাড়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং ভারতের পরমাণু কর্পোরেশনকে ৬ মে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, কুডানকুলাম পরমাণু প্রকল্পের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে সুপ্রিম কোর্টকে। শুধু তামিলনাড়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দিয়েছে, বাকিরা দেয়নি। তা না দিয়েই চুল্লি চালু করার ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে অ্যাটমিক এনার্জি নিয়ন্ত্রক সংস্থা। শোনা যাচ্ছে, চুল্লি চালুও হয়ে গেছে। তারই প্রতিবাদে ইদিনথাকারাই-এর মৎস্যজীবী পরিবারগুলি ইদিনদথাকারাই গ্রামে ঢোকার রাস্তায় শুয়ে পড়ে আমৃত্যু পরমাণু দৈত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ নিল ১৫ জুলাই। সঙ্গের ছবি অ্যান্টনি কেবিস্টন ফার্নান্ডোর তোলা।

‘তোমাকেও লাইনে হাত পেতে দাঁড়াতে হবে মনে রেখো’

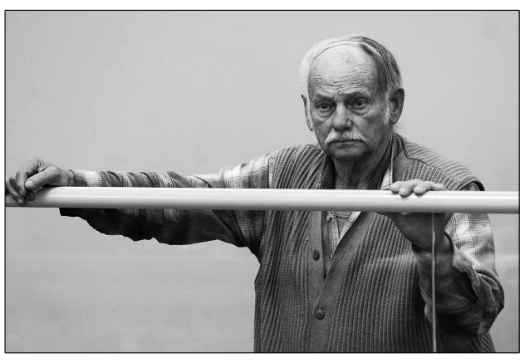

শাকিল মহিনউদ্দিন, মেটিয়াব্রুজ, ৫ জুলাই, ছবি ইন্টারনেটে •

জীর্ণ শরীরটায় হাড় আর মাংসের শত্রুতা, কোনোরকমে পেশিসুতো দিয়ে ট্যাগ করা। ঢিলেঢালা চামড়া নেমে যেতে যায়, তারা জানান দেয় লোকটার বয়স পঁচাত্তর থেকে আশির মধ্যে। চশমার ভেতরে মৃতপ্রায় চোখদুটো আর স্বপ্ন দেখে না। কিন্তু আগে দেখত বলে মনে হয়। কর্মক্ষেত্রে তাঁর সুনামের ছড়াছড়ি। সততা, নিষ্ঠা ছিল তাঁর সম্বল, ব্যবহারে অমায়িক। কোনোদিন কারোর রাগ শোনেননি, এমনকী বড়োবাবুর পর্যন্ত। দিনরাত ভাবতেন গ্রাহককে কীভাবে সন্তুষ্ট রাখা যায়। আরও সুন্দর পরিষেবা দিতে কী কী করণীয় তাঁর। এখন পেনশনের কয়েকটা টাকার আশা করেন, কোনোরকমে বেঁচে থাকার এতটুকু আশা, কম টাকায় চালিয়ে নেওয়ার ছোট্ট একটা বাজেট।

এখন পেনশনভোগীদের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মানুষটি। সরু সরু পা জানিয়ে দেয় — ‘অনেকক্ষণ হল, আর পারছি না, এবার মুক্তি দিন!’ বসার জায়গা নেই। ব্যাঙ্কের লম্বা লম্বা চেয়ারগুলো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, রেকারিং অ্যাকাউন্টওয়ালাদের দখলে। তাদের অনেক টাটকা স্বপ্ন, জীবনকে উপভোগ করার রঙিন আমেজ তাতে, তহবিলকে আরও পাকাপোক্ত করার স্বপ্ন। সঞ্চয়ের খাতা উপচে পড়ে, চলে যায় পরের পৃষ্ঠায়। এদিকে প্রায় চার ঘণ্টা লাইন দেওয়ার পর শোনা গেল — ‘ইয়ার এনি্ডংয়ের জন্য পেনশন এখনও ঢোকেনি’। পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সেক্শনে সারা বছরের করা আর না-করা কাজের বোঝা, সেইজন্যই দেরি। তবে দিনের আলো এখনও রয়েছে, ঢুকলেও ঢুকতে পারে, লাইন ছেড়ে বেরোয় না কেউ। হা-হুতাশ, কষ্টের গোঙানি পৌঁছায় না বসে থাকা ভদ্রলোকেদের কানে। দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে চলতে শুরু করেছে। ... না আজকে আর ফিরতে হবে না খালি হাতে, পেনশন এসে গেছে অ্যাকাউন্টে। টাকা পাবেন — মরা চোখে কেমন একটা ঔৎসুক্যের ঝিলিক। মাত্র ক-টি টাকা — তাতে মুদিখানা, আনাজওয়ালা, ইলেকট্রিকের বিল, নিজের ওষুধপত্র, স্ত্রীর ডাক্তারখানা ...

লাইনে আর মাত্র দুজনের পরে, তারপরেই ... তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ, জল খাওয়া দূরে থাক, টাকা পেলে একমাসের জমে থাকা তেষ্টার নিবারণ হবে। লাইন এসে গেল — চেক

বাড়ালেন — চেক ফেরত এল। কাঁচের ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে, ‘আপনার সই মিলছে না, কিছু করার নেই।’ বলেই ডাকলেন পরেরজনকে। লোকটি অনুনয়-বিনয় করে বললেন, ‘ইদানীং হাতটা বড়ো কাঁপে বাবা। এই বয়সে কি আর ঠিকঠাক হয়? দিয়ে দাও না বাবা। আমি তো প্রতিমাসেই আসি।’

চড়া মেজাজে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ভেতর থেকে বলা হল, ‘বলছি হবে না, আপনি সরে যান। কোথা থেকে আসে সব! যান যান ম্যানেজারবাবুর কাছে।’

লোকটি নিরুপায় হয়ে ম্যানেজারবাবুর কামরার দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু তিনি নেই। একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন মেন অফিসে। অসহায় লোকটি ফিরে এসে আবার অনুরোধ করলেন, ‘তুমি আমার ছেলের মতো বাবা, এই বুড়োটাকে আর কষ্ট দিও না।’ তাতেও ব্যাঙ্কবাবু রাজি হলেন না, হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ‘যান বেরিয়ে যান বলছি। বিরক্ত করবেন না।’

লোকটি ধৈর্য হারিয়ে রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন, কাঁপা গলায় বললেন, ‘তোমাকেও একদিন লাইনে এইভাবে হাত পেতে দাঁড়াতে হবে মনে রেখো। ... আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি, রেহাই যেন না পাও।’

গ্রাহকরা ছুটে এসে প্রবীণ লোকটিকেই ধমকালেন। কেউ কেউ বললেন, আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন, ওরা নিয়মের অধীন। ওদের তা মানতেই হবে। নাহলে ওদের চাকরি নিয়ে ...

লোকটির দু-চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকল। সে জলধারা কিন্তু নিয়ম মানে না।

শিবপুরে গদাধর মিস্ত্রি লেনে দশ কাঠার পুকুর বোজানো প্রায় শেষ

পুকুর বুজিয়ে তৈরি হওয়া বাড়ি সহ পুকুরের ছবি শান্তনু চক্রবর্তীর। তাঁর কথায়, পুকুরটির বেশিরভাগ অংশই বুজিয়ে তার ওপর বাড়ি বানানো হয়ে গেছে। এক চিলতে অংশ পড়ে আছে, সেটুকুও সবুজে ভর্তি। জল প্রায় চোখেই পড়ে না। কেবল পড়শিদের সঙ্গে কথায় বোঝা যয়, ক-দিন আগেই এখানে ছিল এক বিশাল পুকুর।

কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল, শিবপুর, হাওড়া, ৩০ জুন •

শিবপুর হাওড়ার গদাধর মিস্ত্রী সেকেন্ড বাই লেনের বাসিন্দা অলোক ব্যানার্জি। তিনি নিজে পেশায় মাছ বিক্রেতা। তার নিজের কথায়, ‘ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের নিচে মাছ বিক্রি করতাম। লোক ঠকানো ভেড়ির মাছ নয়, পুকুরের মাছ। আজ ছ-মাস হল আন্দোলন করতে গিয়ে বেকার, বাড়িছাড়া।’

ওর এলাকাতেই পাঁচ নম্বর গদাধর মিস্ত্রি সেকেন্ড বাই লেন, থানা শিবপুর, হাওড়া ৭১১১০৪, ওয়ার্ড নং ৪২ এ ছিল একটি দশ এগারো কাটা পুকুর। ১৯৯৪ সাল থেকে বেআইনিভাবে পুকুর বোজানো শুরু হলে, ৯/২/১৯৯৫ তারিখে প্রথম উনি এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে গণ পিটিশন করেন হাওড়া কর্পোরেশনে। এরপর বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওদের আবেদনের ভিত্তিতে ডিএলআরও-র নির্দেশে বার চারেক কাজ বন্ধ হয়, ফের শুরু হয়। বর্তমানে ২০১২ থেকে পুকুরের ওপরে চারতলা একটি বাড়ি নির্মাণ চলছে। গ্রীন বেঞ্চের বিচারপতি এসে দেখে গেছেন। কিন্তু কোনো স্থগিতাদেশ দেওয়ার আগেই কনস্ট্রাকশন কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, নির্মাণ চলছে।

অলোকবাবু চক্রবেড়িয়া জেলে সমিতির ষাট সত্তর জন জেলে এবং পাইকারদের নিয়ে আন্দোলন করতে সচেষ্ট। খুব শীঘ্রই ওরা আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নেবেন। পরিশেষে ওনার প্রশ্ন, এইভাবেই কি হাওড়া শিবপুর অঞ্চলের সমস্ত পুকুর বুজিয়ে বাড়ি উঠবে? তাহলে পুকুরের ওপরে নির্ভরশীল জেলে পাইকারদের জীবিকা কী হবে?

সম্পাদকের কথা

উত্তরাখণ্ডের ত্রাণ ও পুনর্গঠন কোন পথে

ভয়াবহ বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগে ত্রাণ সংগ্রহ চলছে। শত শত গ্রাম এবং গ্রামের মানুষ বিপন্ন, গৃহহীন। এছাড়া পর্যটক ও তীর্থযাত্রীরাও বিপদের মধ্যে পড়েছিল। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বিপন্নতার মধ্যে যারা বেঁচে রয়েছে, তাদেরও জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, চিকিৎসা, বস্ত্র ও আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করা এই ত্রাণ সংগ্রহের আশু লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু এত বড়ো এক বিপর্যয়ে দীর্ঘমেয়াদি ত্রাণ এবং পুনর্গঠনের দায়িত্বও একই সঙ্গে এসে পড়েছে আমাদের ওপর। সেদিক থেকে কয়েকটা বিষয় খেয়ালে রাখা আমাদের দরকার। এক, আশু ত্রাণ সংগ্রহের উদ্যম অনেক সময়ই অল্প সময়ের মধ্যে ফুরিয়ে যায়। আরও নানান সমস্যা সামনে এসে পড়ে। তখন উত্তরাখণ্ডের বিষয়টা গৌণ হয়ে যাবে। যেমনটা হয়েছিল সুন্দরবনের আয়লা ঝড়ের সময়। এটা আমাদের খেয়ালে রাখা প্রয়োজন।

দুই, পুনর্গঠন মানে কী? আমরা কোন পুনর্গঠন চাই? উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ে আবার সেই প্রশ্ন সামনে এসেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম বলেছেন, 'আমরা উত্তরাখণ্ড পুনর্গঠন করব'। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি অতিকায় সব সংস্থার সাহায্য নেওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও বিপুল অর্থ ও প্রশাসন নিয়ে মাঠে নামার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু এইসব বড়ো বড়ো দাম্ভিক ঘোষণা দেখেই ভয় হয়। কারণ 'উন্নয়ন'–এর নেশায় বুঁদ এইসব উদ্যোক্তারা 'গঠন' বলতে বোঝে বড়ো বড়ো রাস্তা, ইমারত, জলাধার, ড্যাম আর পাকা বাড়ি নির্মাণ। সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্নয়নের পথেই পাহাড়ময় উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই জিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অ্যাক্টিং ডিরেক্টর এস কে ত্রিপাঠি বলেছেন, '১৫ জুনের বিপর্যয় আবার ঘটতে পারে। হিমবাহের কাঁচা বরফ ভেঙে ঘটনাটা ঘটেছে এবং বিপদের পরিস্থিতি এখনও কেটে যায়নি।' বিজ্ঞানীদের মতে, কেদারনাথের মন্দির সরাতে হতে পারে। যদি তা নাও সম্ভব হয়, তবে মন্দিরের চারপাশে ঘনবসতি সরাতে হবে। এখনকার মন্দিরের দেড় কিলোমিটার নিচে মন্দাকিনী নদীর বামদিকে ০.৭৫ কিমি লম্বা ও ২০০ মিটার প্রশস্ত একটা জায়গা মন্দিরের পক্ষে নিরাপদ। একথা বলেছেন শ্রীত্রিপাঠি। অতএব, উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে নজরে না রেখে বেপরোয়াভাবে উন্নয়নের যে মডেল চালানো হয়েছে, সেখান থেকে সরে আসতে হবে।

তিন, অনেকেই উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও জনসমাজকে ভুলে পর্যটন ও তীর্থস্থান হিসেবেই ওই অঞ্চলকে দেখতে চায়। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী তো বিপর্যস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়েই প্রথমে কেদারনাথ মন্দির পুনর্গঠনে হাত লাগানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এবং দিল্লির কংগ্রেসি নেতাদের আঁতে ঘা লাগে। তাঁরা জানিয়ে দেন, মন্দির তাঁরাই গড়বেন। তড়িঘড়ি আর্কিওলজিকাল সার্ভের লোকেদের ক্ষতির বহর জরিপ করতে কেদারনাথে পাঠান দিল্লির নেতারা। খারাপ আবহাওয়ার দরুন সেই প্রতিনিধিরা ফিরে চলে যান। এসব থেকে বোঝা যায়, উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ের সঙ্গে লোক ঠকানো মন্দিরের রাজনীতিকে জড়িয়ে নিতে চাইছে রাজনৈতিক নেতারা। এতে বিশেষ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উত্তরাখণ্ডের প্রকৃত পুনর্গঠন ব্যাহতই হবে।

আমাদের ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচিগুলিকে এইসব আপদ থেকে মুক্ত হতে হবে।

পাঠকের চিঠি

নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করার আবেদন

আগরপাড়া স্টেশনে দেখলাম অনেকগুলো মুণ্ডহীন গাছের ধড় তাদের চারদিকে বাঁধান বেদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর একটানা রেল কোম্পানির টিনের শেড। কোন কোন গাছ আবার বাড়তে বাড়তে টিনের শেডে ধাক্কা খেয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। স্টেশনের চায়ের দোকানীর কাছে জিজ্ঞেস করে জানলাম — গাছগুলো আগে থেকেই ছিল; হালে টিনের শেড লাগানো হয়েছে। মাঝেমাঝে রেলকোম্পানির লোক এসে ওগুলোর মাথা ছেঁটে দেয়। কেন যে এমন ধারাবাহিক নৃশংস কাণ্ডের ব্যবস্থা জানি না। আজ দুপুর ১২টা নাগাদ আগরপাড়া থেকে ট্রেন ধরে শিয়ালদায় আসার জন্য যখন প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলাম, তখন একটা ওরকম মাথা কাটা গাছের গা থেকে গজানো একটা ডালে কয়েকটা নতুন পাতা আমাকে অনুরোধ করে তাদের মাথার উপর থেকে টিনের শেড সরিয়ে নেওয়ার জন্য রেলকোম্পানিকে বলতে। আমারও মনে হয় গাছগুলোর মাথার উপর খানিক জায়গা ফাঁকা রেখে টিনের শেড লাগালে কারোরই কোনো অসুবিধা হয় না। তাই এ ব্যপারে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপনাদের কাগজে এই চিঠি পাঠালাম।

'আমলামহলে জৈবপ্রযুক্তিতে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার জন্য অলিখিত নির্দেশ আছে'

পশ্চিমবঙ্গের জৈবপ্রযুক্তি কাউন্সিলের গভর্নিং বডির সদস্য বিজ্ঞানী তুষার চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, ৩০ জুন। পশ্চিমবঙ্গের নয়া জৈবপ্রযুক্তি নীতির খসড়া : http://biotechbengal.gov.in/Biotechnology-Policy-Revised.pdf •

সরকারি জৈবপ্রযুক্তি নীতি

আমাদের কোনো জৈবপ্রযুক্তি মন্ত্রক নেই। এটি একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর (ডিএসটি) প্রথম এই ব্যাপারে নজর দেয়। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিষয়গুলির মধ্যে এমন অনেক ছিল, যা রাজ্যের অধীন, যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি। কাজেই শুধু জাতীয় নীতি দিয়ে এটা হবে না। রাজ্যস্তরেও একই রকম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর থাকা দরকার।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন জিনিস, যা একটি মন্ত্রকের মধ্যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে না। এখানে অনেকটাই নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ জরুরি। নাহলে তার স্বাধীন বিকাশ হয় না। তাই এই বডিগুলির ফান্ড বা কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হবে, তা যদি সরাসরি সরকার থেকে ঠিক হয়, তাহলে তা বিকৃতি আনতে বাধ্য। একটা স্বাধীন চলার বন্দোবস্ত তার থাকা দরকার। তাই ডিএসটি বা পরে জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর (ডিবিটি) এর ফান্ডের বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হল অরাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ওপর। ফান্ড দেওয়ার যে মিটিংগুলো হয়, সেখানে সরকারের মনোনীত সদস্যটি বা মন্ত্রকের মনোনীত সদস্যটি থাকতে পারে না — এই হল প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত। কেন্দ্রীয় স্তরে এবং রাজ্য স্তরে এটাই বন্দোবস্ত। রাজ্যস্তরে সব জায়গায় ডিএসটি নেই। এখনও পাঁচ ছ–টি রাজ্যে ডিএসটি নেই।

আমাদের রাজ্যে ডিএসটি আছে, তাছাড়াও আছে স্টেট কাউন্সিল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। এই স্টেট কাউন্সিলে কোনো রাজনৈতিক লোক থাকে না। এখানে যারা থাকে তারা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বা কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব কৃতিত্বে সেখানে আসতে পারে। কোন গবেষণা কত ফান্ড পাবে, তার বিচার বন্দোবস্ত এদের মাধ্যমেই হওয়া নিয়ম। আমাদের রাজ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক আছে, তার অধীনে স্টেট কাউন্সিল আছে এবং তাদের আলাদা বাজেট আছে। জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর বা ডিবিটি–ও এই প্যাটার্নেই আছে জাতীয় স্তরে। রাজ্যস্তরে নেই।

ডিএসটি থেকে কেউ যখন কোনো প্রজেক্ট বা প্রকল্প পায়, সেটার বৈজ্ঞানিক দর কতটা, তার নিরীক্ষা হয় অনেকখানি। কিন্তু ডিবিটি–তে এভাবে হয় না। ওখানে রাজনৈতিক খবরদারি অনেকটা কাজ করে। ওখানে ব্যবসায়িক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল) স্বার্থ বেশি পরিমাণে কাজ করে।

আমাদের রাজ্যে জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর নেই বটে, কিন্তু একটা সূচনা হয়েছে বলা যায়, এবং সেটা হয়েছে টেকনিক্যাল এডুকেশন বা প্রযুক্তি শিক্ষণ বিভাগের মধ্যে দিয়ে। এখানে প্রযুক্তি শিক্ষা মন্ত্রকের তৎপরতায় একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি স্টেট কাউন্সিলের মতো একটা জৈবপ্রযুক্তি স্টেট কাউন্সিলও হয়েছে। তারই গভর্নিং বডির সদস্য হওয়ার সুবাদেই আমরা রাজ্যস্তরে একটা জৈবপ্রযুক্তি নীতির খসড়া বানাতে পেরেছি।

তবে এরাজ্যে এখনও জৈবপ্রযুক্তির পূর্ণ মন্ত্রক নেই। পূর্ণাঙ্গ বাজেট নেই। অতএব এখনও অবধি এটা একটা সুপ্ত অবস্থাতেই আছে বলা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে জৈবপ্রযুক্তি নীতিমালা তৈরির ইতিহাস

২০০২ সালে এরাজ্যে একটি জৈবপ্রযুক্তি মন্ত্রক বানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তখনই এখানে একটা জৈবপ্রযুক্তি নীতি বানানো হয়েছিল। তখন যেটা করা হয়েছিল, সেটা যে খুব ভালো একটা নীতি ছিল, তা বলা যায় না। সেকেলে টাইপের ছিল ওটা। তো ২০০৮ সালে ওটাকে পাল্টে একটা নতুন জৈবপ্রযুক্তি নীতি বানানোর তোড়জোড় করেছিল বামফ্রন্ট সরকার।

এই ব্যাপারগুলো আমার জানা ছিল না আগে। কারণ কখনও এই ব্যাপারগুলো পাবলিকের কাছে আনাও হয়নি, এবং আলোচনাও করা হয়নি। আমরা সংবাদপত্রে দেখে ২০১১ সালের প্রথম দিকে চুঁচুড়ায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম। ওখানে খোলা জায়গায় জিন–ধানের 'ফিল্ড ট্রায়াল' বা মাঠ–পরীক্ষা করা হচ্ছিল। আমরা ওখানে যেমন বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম, তেমনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যেহেতু হয়েছিল, তাই আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গেও দেখা করি। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওটা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তখনও আমরা জানতে পারিনি যে একটা জৈবপ্রযুক্তি নীতি নতুন করে বানানো হচ্ছে।

তারপর সরকার বদল হওয়ার পর নয়া জৈবপ্রযুক্তি নীতি বানানোর বিষয়টা আমরা জানতে পারি। আমি ওটাতে সামিল হই এই কারণেই, যাতে এই যে খোলা মাঠে যে জিন–শস্যের পরীক্ষা বা ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে, সেগুলির বিষয়ে নতুন নীতিটি একটা সুচিন্তিত ব্যবস্থা নিতে পারে। তখন আমরা দেখতে পেলাম, ২০০৮ সালে একটা জৈবপ্রযুক্তি নীতির খসড়া বানানো হয়েছে, যেটি ভীষণভাবে স্ববিরোধী। দেখতে পেলাম, বামফ্রন্ট সরকার খোলা জায়গায় ফিল্ড ট্রায়াল এবং অন্যান্য জিন–শস্যের বিপজ্জনক দিকগুলোকে ওই নীতির মধ্যে জায়গাও দিয়েছিল। মুখে যদিও ওরা তা কখনও স্বীকার

খসড়া জৈবপ্রযুক্তি নীতি (পশ্চিমবঙ্গ)

- *এ রাজ্যের বিশেষ জৈব–সম্পদ চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও সহনশীল ব্যবহার*
- *জনস্বাস্থ্যে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার করে সুলভে রোগনির্ণয় ও প্রতিরোধ*
- *জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দূষণ প্রতিরোধ*
- *জৈবপ্রযুক্তি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো*
- *জৈবপ্রযুক্তির জ্ঞানের ভিত্তিতে কৃষি–বাস্তুতান্ত্রিক চর্চাকে মদত দেওয়া*
- *২০০৯ সালের রাজ্য কৃষি বিষয়ক কমিশনের পরামর্শ মেনে অবাঞ্ছিত জিন–খাদ্য ও জিন–শস্যের বদলে বিকল্পের সন্ধান*
- *জৈব–সার, জৈব–কীটনাশক সহ কৃষি সহায়ক বন্দোবস্ত*
- *দূষণহীন, পরিবেশ সহায়ক সবুজ রসায়নে সাহায্য*

করেনি। এবং এগুলো সিপিএমের একচ্ছত্র, অন্যান্য বাম পার্টিগুলোর সঙ্গে আলোচনাও করেনি। মোদ্দা কথায় ওই নীতিতে জিন–শস্যকে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছিল।

ওই বাম সরকারের আমলেই একটু আগে (২০০৯) রথীনবাবুকে দিয়ে একটা কৃষি কমিশন করা হয়েছিল। উনি আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন নথিপত্র ঘেঁটে একটা বিশাল রিপোর্ট বানিয়েছিলেন। প্রায় ছশো পাতার। ওটা বই হিসেবে বেরও হয়েছিল। কিন্তু সরকার ওটা নিয়ে কী করবে তা কখনওই স্পষ্ট করেনি। লোকেও ওটা জানতে পারেনি। মন্ত্রকের মধ্যেও ওটা নিয়ে আলোচনা করেনি। বকলমে যেটা হয়, ওটার জন্য রথিনবাবু অত্যন্ত ধিক্কৃত হতে থাকেন। যেহেতু উনি জিন–শস্যর বিরুদ্ধে তথ্য দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ওই রিপোর্টে, তাই ওনাকে বলা হয়, উনি বিজ্ঞান বিরোধী। আমি এই প্রক্রিয়াতে ঢুকে ব্যাপারগুলো জানতে পারলাম।

আমরা সাকুল্যে চারদিন সময় পেয়েছিলাম নতুন একটি নীতির খসড়া বানানোর জন্য। আমরা ঠিক করেছিলাম, নীতিটা খুব ছোটো রাখব, তাতে মৌলিক নীতিগুলো থাকবে। আগের নীতিটি ছিল বেশ বড়ো। তাতে আমাদের যে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, সেগুলোর অধিকর্তাদের একটু খুশি করার চেষ্টা ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, একটা লবি তৈরি করা। যারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কাজ করবে। লবির একটা ভূমিকা থাকতেই পারে। কিন্তু নীতিমালাটাই যদি হয়ে যায় লবিমালা তাহলে মুশকিল। এমনকী জাতীয় নীতিতেও এ চেষ্টা ছিল না।

কর্পোরেট ও লবির স্বার্থ

আসলে আইএএস এবং আমলা স্তরে জৈবপ্রযুক্তিতে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার জন্য একটা পুরো অলিখিত নির্দেশ আছে। যেটা ডিএসটি–র ক্ষেত্রে সাধারণত ঘটে না। কিন্তু ডিবিটি–র মধ্যে ঘটে। ওটার মধ্যে কর্পোরেট এবং লবির স্বার্থরক্ষার চেষ্টা প্রচুর। যেমন আমার ধারণা, আইসিএআর (ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ)–ও পুরো মাথা নুইয়ে দিয়েছে এখন। আইসিএমআর (ভারতীয় মেডিক্যাল গবেষণা পর্ষদ) ও প্রায় তাই। সিএসআইআর–ও সেদিকেই যেতে বসেছে। তাও আমি বলব, ডিএসটি বা পরিবেশ মন্ত্রক এখনও একটু ছোটো ছোটো বলে এর মধ্যে আমলারাও এখনও কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। অন্যান্য সব বডিগুলিতে এমন ধরনের লোককে ডেকে ডেকে বসানো হচ্ছে, যারা একেবারে লবির লোক। সেটা আমরা এই রাজ্যের জৈবপ্রযুক্তি নীতি তৈরি করতে গিয়েও বুঝলাম। কারণ যখন আমরা এটা করলাম, সেটাকে অনেক দেরি করিয়ে দেওয়া হল (প্রায় নব্বই দিন, কোনো কারণ ছাড়াই)। এই দেরি করানোর কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, কেউ কেউ চাইছিল, এরই মধ্যে যদি কিছু কেন্দ্রীয় নীতি কার্যকর হয়ে যায়। যাই হোক, আমাদের মন্ত্রী যিনি, তার একটা সদিচ্ছা থাকায় এবং বাস্তববুদ্ধি থাকায় কিছুটা সাহায্য হয়েছে। উনি খসড়া নীতিটাকে ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। যাতে অন্যান্য রাজ্যগুলিও জানতে পারে, আমরা কী করছি। আগের পলিসিগুলো যখন তৈরি করা হয়েছিল, তখন এগুলো করা হয়নি।

ব্রাই বিল

জাতীয় স্তরে জৈবপ্রযুক্তি নীতি করা হলেও, যেহেতু এর মধ্যে কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় আছে, তাই রাজ্যগুলি এ বিষয়ে তাদের ভূমিকা বজায় রাখবে। আজকে যখন কেন্দ্রের ব্রাই বিল (ভারতের জৈবপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিল) নিয়ে কথা উঠছে, তখনও আমরা এই কথাগুলি বলেছি। রাজ্যগুলির অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকবে জৈবপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করার, নীতি প্রণয়ন করার। যদি প্রতিটি রাজ্যই এটা বলে, তাহলে ব্রাই বিল যেভাবে পাস করাতে চাইছে কেন্দ্র, তা হবে না। তবে অন্যান্য রাজ্যগুলি সেটা করুক বা না করুক, ব্রাই বিল আইনগতভাবেই অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু শেষ বিচারে প্রতিবাদ না করলে কোনোকিছুই তো সেভাবে কাজ করে না। আইনটাও কাজ করবে না।

উত্তরাখণ্ডের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ মেটিয়াবুরুজ–মহেশতলায়

জিতেন নন্দী, ১৩ জুলাই, ছবি প্রতিবেদকের তোলা • ৭ জুলাই মেটিয়াব্রুজ–মহেশতলার সমবেত লিট্‌ল ম্যাগাজিন মঞ্চ 'মাটির কেল্লা' উত্তরাখণ্ডের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষের ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচি নেয়। সকাল ন–টায় আকড়া ফটকে জড়ো হয়ে অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। এতে মাটির কেল্লার সঙ্গে যোগ দেয় 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু সায়েন্স সার্কেল', 'প্রবীণ নাগরিক সংস্থা', 'নেতাজি সুভাষ রিক্রিয়েশন ক্লাব' এবং 'জগদ্ধাত্রী মিলনী সংঘ'–এর স্থানীয় বন্ধুরা। রবীন্দ্রনগর পরিক্রমা করে দুপুর বারোটায় ঘোষপাড়ায় গিয়ে ওইদিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। এরপরেও আকড়া ফটকের অটোচালকেরা এবং এলাকার মানুষ সাহায্য করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগিয়ে আসে। এছাড়া মেটিয়াবুরুজ বড়তলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরাও অর্থ সংগ্রহ করছে বলে জানা গেছে। আকড়া ও সন্তোষপুরেও এই কর্মসূচি নেওয়া হবে।

'মেঘ ভেঙে নয়, সকালে লেক ভেঙে ধ্বংস কেদার'

ধনবীর পামার সেন্টার ফর গ্লেসিয়ার স্টাডিজ–এর গবেষণাকর্মী। উনি ১৭ জুন কেদারনাথের শহরেরও অনেকটা উঁচুতে গান্ধী সরোবরের ১০০–১৫০ মিটার দূরে ক্যাম্প করে ছিলেন গবেষণার জন্য। গান্ধী সরোবর ভেঙে পড়েছিল তার সামনেই। নিচে তার সাথে তিলক সোনির কথোপকথন, ৮ জুলাই। •

তিলক : ওইদিন কী হয়েছিল?

পামার : সেদিন আমি ওখানেই ছিলাম। সকাল ছ'টা চল্লিশ মিনিটে ওই সরোবরটি ফেটে যায়।

তিলক : কেউ বলছে মেঘ ভেঙেছিল। কেউ বলছে সরোবরটি ভেঙে পড়েছিল। ঠিক কী হয়েছিল সেদিন ওখানে?

পামার : মেঘ ভেঙেছিল আগেরদিন সন্ধ্যেবেলা পাঁচটা নাগাদ। কিন্তু ১৭ তারিখ সকালে পৌনে সাতটার সময় লেক ভেঙে গিয়েছিল। ... ওই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। আমাদের বেরিয়ে মাপজোক নেওয়ার জন্য ডিসচার্জ পয়েন্টে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য আমরা যেতে পারিনি। তাই তাঁবুতেই আমরা দু–জন শুয়ে ছিলাম। এমন সময় মাটি কাঁপতে শুরু করল। আমি বন্ধুকে বললাম, দাঁড়িয়ে পড়ো। বন্ধু যেই তাঁবুর জিপারটি খুলেছে, দেখল তাঁবুর পাশেই জল। আমরা তখন বেরিয়ে এলাম। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সরোবরটি ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ঢেউ উঠে যায়, সুনামির মতো। তারপর আর নিচে কিছু দেখা যায়নি। অন্ধকার হয়ে যায়। ধোঁয়াশায় ভরে যায়। দশ মিনিট বাদে যখন একটু পরিষ্কার হল, তখন নিচে তাকিয়ে দেখলাম, কেদার মন্দিরের ওখানে কিছুই নেই।

তিলক : আপনারা বাঁচলেন কীভাবে?

পামার : আমরা তো এই কাজ করি, তাই আমাদের প্রশিক্ষণ আছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে নিচে নেমে আসতে থাকি সাবধানে। বাসুকিতালের রাস্তা দিয়ে।

তিলক : সরোবর ভেঙে জল কি গিয়ে মন্দাকিনী নদীতে গিয়ে মেশে?

পামার : প্রথমে গিয়ে সরস্বতীতে মেশে, তারপর মন্দাকিনী–তে।

তিলক : মন্দিরটা বাঁচল কীভাবে?

পামার : মন্দিরটা তো বাঁচার কথাই নয়। বড়ো বড়ো বিল্ডিং ভেঙে পড়ল, আর মন্দিরটা বেঁচে গেল। সব ভোলেবাবার ইচ্ছা। সে হয়ত চেয়েছিল, মন্দিরটা বাঁচুক, আর বাকি সব চুলোয় যাক। (হাসি)

তিলক : আপনি তো হিমবাহের গলনের গবেষণা করেন। মেঘ ভাঙার সঙ্গে হিমবাহের গলনের কোনো সম্পর্ক আছে?

পামার : না নেই। আসলে এত উঁচুতে মেঘ ভাঙার কথাই নয়। কারণ অত উঁচুতে এত জোরে বৃষ্টিই হয় না।

তিলক : আপনি নিচে কেদারনাথ শহরে এসে কী দেখলেন?

পামার : বাসুকিতালের রাস্তা ধরে নিচে পাওয়ার হাউসে দুপুর ২ টা নাগাদ পৌঁছনোর পরে দেখলাম, পাঁচ ছয় জন বেঁচে আছে, বাকি আর কেউ নেই। ওই পাওয়ার হাউসে আমরা জামাকাপড় বদলালাম, চা বানিয়ে খেলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আবহাওয়া কিছুটা পরিষ্কার হলে একটা হেলিকপ্টার এল। কিন্তু এখানে ল্যান্ডিং না করে আবার ফিরে এল। সন্ধ্যেবেলা আরও কিছুটা পরিষ্কার হলে বেশ কিছু মানুষ মন্দাকিনী নদী পেরিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তখন নদীতে প্রচুর মানুষ ভেসে যায়।

যাত্রী পরিষেবা শিকেয়, এক রেলকর্মী সমাধান বললেন : ম্যানেজারদের গণধোলাই

শমিত, শান্তিপুর, দশটা পাঁচের নিত্যযাত্রী, ২০ জুন •

প্রায় বছর খানেক ধরে সকাল দশটা পাঁচের ডাউন কৃষ্ণনগর–শিয়ালদহ (ভায়া শান্তিপুর) লোকাল ট্রেনটির ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় নেই। ৫–১০ মিনিট দেরিতে প্রায় রোজই ছাড়ছে, কোনো কোনো দিন ৪০ মিনিট ১ ঘন্টা দেরিতে ছাড়তে দেখা যাচ্ছে ট্রেনটিকে। যথারীতি যাত্রীদের অসুবিধা প্রায় দৈনিক একটা বিষয়। এজন্য যাত্রীদের উষ্মা, বিরক্তি, ক্ষোভ, সহনশীলতা সবই লক্ষ্য করা যায়।

গত ১৮ জুন যথারীতি ট্রেনটি প্রায় ৪৫ মিনিট দেরিতে ছাড়তে দেখা গেল। দৈনিক যাত্রীরা কেউ কেউ স্টেশন মাস্টারের কাছে গেলেন। তাঁরা জানালেন, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের দেরি হয়ে যাওয়ার অসুবিধার কথা। স্টেশনমাস্টার তাঁর অপরাগতার কথা যাত্রীদের জানালেন।

এখানে জানানো দরকার, ট্রেনটি দেরিতে ছাড়ার অন্যতম যুক্তি — আপ শিয়ালদহ–শান্তিপুর লোকাল ট্রেনটি না ঢুকলে এই ডাউন ট্রেনটি ছাড়া যাবে না, কারণ শান্তিপুরে গার্ড–বাক্স পরিবর্তন করতে হয়। ড্রাইভারও পরিবর্তন করতে হয়। সে কারণে যতক্ষণ না আপ–ট্রেনটি ঢোকে শিয়ালদাগামী ডাউন ট্রেনটি ছাড়তে পারে না। যদিও আপ ট্রেন সকাল ১০–৪০ মিনিটে ছেড়ে রানাঘাট পর্যন্ত গিয়ে যাত্রা সমাপ্ত করে। প্রায়ই দিনই এ ঘটনা ঘটায় যাত্রীরা একপ্রকার অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলা যায়।

ওইদিনও যখন ট্রেনছাড়ার দেরিতে যাত্রীদের ভেতর ক্ষোভ–বিক্ষোভ কথা–বার্তা চলছে। এর বিহিত কী করে করা যেতে পারে তা নিয়েই মূলত কথাবার্তা, যুক্তি এসবের মধ্যে ডাউন ট্রেনটির জনৈক ড্রাইভার তার প্রতিক্রিয়ায় জানালেন — ‘কত ট্রেন বেড়েছে বলুন তো? রেলের কর্মী সংখ্যা কি বেড়েছে? সেই কবে থেকে রিক্রুটমেন্ট বন্ধ রয়েছে রেল–এ। আমাদের ৩৬৫ দিনে ৩৫০ দিন কাজ করতে হচ্ছে। রেলের ট্র্যাক কি বেড়েছে? যাত্রী পরিষেবার উন্নতি হবে কীভাবে? একটা ট্রেনকে একাধিক বার রান করাবার পরও ঠিকমতো মেনটেনেন্স করা যাচ্ছে না। এসবের ফলেই ভুগতে হচ্ছে যাত্রীদের।’

তাঁর এই কথার মধ্যে দিয়ে রেলদপ্তরে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কথাই উঠে এল। এ সমস্ত ব্যাপারে কোনো রেলকর্মী যদি অতি সক্রিয়তা দেখায়, তাহলে তাদের ওপর শাস্তির খাঁড়াও নামতে পারে। তিনি জানালেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। কিছুদিন আগে কোনো একটি ট্রেনে ড্রাইভার হিসাবে থাকাকালীন তিনি দীর্ঘক্ষণ ট্রেনটি স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখার কারণ জানতে চাওয়াতে তাঁকে বিভাগীয় তদন্তের জালে পড়তে হয়েছে। এ সমস্ত খোলামেলা কথাবার্তা যাত্রীদের সঙ্গে চলছিল। শেষমেষ যাত্রীরা জানতে চাইলেন, তাহলে করণীয় কী ? — তিনি নির্দ্বিধায় বললেন, ‘গণধোলাই’। রেলওয়ে পরিচালনকারীদের একধারসে গণধোলাই। সেটাই একমাত্র পথ।

সেদিন ট্রেনটি ছাড়ল — দশটা সাতান্ন মিনিটে।

ট্যাক্সের কাগজ এসেছে, বদরতলাও নাকি কলকাতা মেগাসিটির আওতায়!

সুব্রত দাস, বদরতলা, মেটিয়াবুরুজ, ১৩ জুলাই •

কলকাতা কর্পোরেশনের ১৫নং বরো–র ১৪১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আমরা। সম্প্রতি আমাদের বরোর বাড়ির ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমার কাছে চিঠি এসেছিল, তাতে উল্লেখ ছিল যে আমাদের বাড়ির নতুন করে ট্যাক্স নির্ধারিত হবে। আমি নিজের তাগিদে ওই ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করে এর কারণ জিজ্ঞাসা করি? তিনি বলেন, ‘দুঃখিত, কলকাতা কর্পোরেশন মেগাসিটি প্রকল্পের অন্তর্গত। অতিরিক্ত ট্যাক্স আপনাকে দিতেই হবে।’ আমি এক এক করে ওঁর কাছে কলকাতার প্রান্তিক ওয়ার্ড ১৪১ নম্বরের চালচিত্র তুলে ধরি।

১। আমাদের বদরতলা থেকে দেড়–দুই কিমি পায়ে হেঁটে যাওয়ার পর পাই পাবলিক বাস। কোনো সরকারি বাস নেই, বদরতলা (রাজাবাগান বাসস্ট্যান্ড) থেকে ছাড়ে তিনটে বাস। শিয়ালদহগামী ১২নং বাসে বসলে শিয়ালদহ পৌঁছাতে সময় লাগে কমপক্ষে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা। ওই সময়ে ধর্মতলা থেকে বাসে ১৮৫ কিমি দূরে দীঘা পৌঁছে যাওয়া যায়! বদরতলা থেকে ছেড়ে রামনগর হয়ে সোজা তারাতলা, তারপর আবার টাঁকশালের আগে বাঁক নিয়ে পিছনে হাইড রোড, আরও পিছনে এসে সিগারেট কলের ক্রসিং থেকে পুরো বিএনআর ঘুরে নজরুল সেতুর মুখে বেরিয়ে শিয়ালদহ যাত্রা, সময় তো লাগবেই! অন্যভাবে ট্রেন বা ট্যাক্সি ধরলে শিয়ালদহ পৌঁছাতে চল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সময় লাগে। আর একটা বাস ১২এ, বদরতলা স্ট্যান্ড থেকে হাওড়া যেতে লেগে যায় আড়াই ঘন্টা। এটাও দুনিয়া ঘুরতে ঘুরতে হাওড়া পৌঁছায়! আদতে এটাও গাড়িতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের পথ। বদরতলার লোকে শিয়ালদহ বা হাওড়া যেতে এই বাস দুটোতে সাধারণত ওঠে না। একমাত্র বদরতলা থেকে ধর্মতলাগামী ১২ শাট্‌ল বাসটাতে সাধারণ যাত্রীরা ওঠে। এই বাস ধররমতলা পৌঁছে দেয় পঞ্চাশ মিনিটে। তবে বর্তমানে কোনো বাসই সময় মতো চলতে পারছে না। কারণ গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্সের রাজাবাগান ৪৪নং গেটের সামনে তানসিয়া গ্রুপের ভূগর্ভস্থ ড্রেনেজ লাইনের কাজ চলার দরুন দীর্ঘকাল ধরে এক দুর্বিসহ পরিস্থিতি চলছে। দু–চাকা যান কিংবা রিক্সা চলাও দুষ্কর। অনেক পথ ঘুরে ঘুরে নিত্যদিন সাধারণ মানুষ, প্রাইভেট গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, এমনকী অটো যাতায়াত করছে। রামনগর থেকে আমাদের বদরতলা মোল্লাপাড়া পর্যন্ত একটা অটো চলে। সন্ধের পর সেই অটো আর আমাদের বদরতলায় ঢোকে না, বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী নামিয়ে দেয়। তখন দীর্ঘ পথ রিক্সা নয় পায়ে হেঁটে বদরতলায় যেতে হয়।

২। বদরতলায় কোনো নার্সিং হোম নেই। সরকার পরিচালিত হাসপাতাল আছে। তবে সেখানে ডায়েরিয়া ছাড়া অন্য কোনো রোগের চিকিৎসা হয় বলে আমার জানা নেই। কোনো এক্স–রের ব্যবস্থাটুকুও নেই। সামান্য সমস্যা নিয়ে গেলে বলে পিজি–মেডিকালে চলে যান। রাতবিরেতে বিপদ ঘটলে কোয়াক বা হাতুড়ে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতে হয়।

৩। পুরো ১৪১নং ওয়ার্ডে কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ লাইন নেই। সারা কলকাতা জুড়ে নতুন করে মাটির তলায় ড্রেনেজ লাইন করা হল। ১৪১নং ওয়ার্ড বাদ পড়ল। বর্ষার সময় নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

৪। এতদঞ্চলে টাইম কল দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হয়। যেগুলো আছে, এক বালতি জল ভরতে সময় লাগে কমপক্ষে দশ মিনিট। ইদানীং সকালের দিকে একটা কর্পোরেশনের জলের গাড়ি আসে মাঝে মাঝে।

৫। আমাদের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সন্তোষপুর। ওই স্টেশনে যাওয়ার কোনো বাস বা অটো নেই। নিজস্ব সাইকেল আর নয়তো রিক্সা ভরসা। আর দুটো জলপথ রয়েছে রাজাবাগান ঘাট থেকে পোদড়া এবং বিচালিঘাট থেকে নাজিরগঞ্জ। এই দুটো ঘাট থেকে যদি হাওড়া বা আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত লঞ্চে যাওয়া যেত, তাহলে সড়কপথের ঝামেলা এড়িয়ে মানুষের উপকার হত।

৬। এর ওপর রয়েছে গঙ্গার পারের ভাঙন। রিভারসাইড রোড, কাঞ্চনতলা প্রভৃতি এলাকায় গঙ্গার ভাঙন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার নিজের চোখের সামনে একটা বড়ো খেলার মাঠ পুরো নদীগর্ভে চলে গেছে।

এসব শোনার পরও কি আপনি বলবেন আমরা মেগাসিটি প্রকল্পের আওতায় এসেছি? অফিসার এসব কথার কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। আমি ট্যাক্সের অতিরিক্ত বোঝা মাথায় চাপিয়ে বরো–অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম, চুপিসাড়েই। কারণ এরপরও কিছু বলতে গেলে মাওবাদী আখ্যা পাই আর কি!

রাজাবাগান ও নাদিয়াল থানা এলাকায় নতুন বাস–রুট চাই

১১ জুন, ডাঃ নাসের আহম্মাদ, মেটিয়াব্রুজ •

কলকাতা কর্পোরেশনের বৃহত্তম ১৫নং বরো–র শেষ প্রান্তে জনবহুল ১৩৮, ১৩৯, ১৪০ এবং ১৪১নং ওয়ার্ডে বাসিন্দাদের জন্য পরিবহনের তেমন কোনো সুবিধা নেই। গার্ডেনরীচের অধীনে রাজাবাগান ও নাদিয়াল থানার অধিবাসীগণ যাতায়াতের খুবই অসুবিধা ভোগ করে। স্বাধীনতার পূর্বে যে ১২, ১২এ ও ১২বি বাস ছিল, তা থেকে গিয়েছে। তা ছাড়া দীর্ঘ ৬৫ বছরে কোনো নতুন বাস–রুট সংযোজন হয়নি। তা ছাড়া ১২, ১২এ বাস সময় মতো পাওয়া যায় না। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অফিসযাত্রীরা সময়মতো কর্মস্থলে যেতে পারে না। এমতাবস্থায় জনগণের আবেদন হল, নাদিয়াল থানার প্রান্তে পুরোনো রেললাইনের ওপর যে নতুন রাস্তা হয়েছে, ওই রাস্তা দিয়ে দুটি রুট চালু হোক। একটি তারাতলা দিয়ে ধর্মতলার দিকে এবং আরেকটি ডায়মন্ডহারবার রোড, বেহালা হয়ে আমতলা পর্যন্ত যেতে পারে। অবিলম্বে এই ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ছাত্রদের রাজনীতি করা নিয়ে স্কুলে বিতর্ক সভা

আনিসুর রহমান, নবম শ্রেণী, ২৭ জুন •

গতকাল শান্তিপুর মুসলিম উচ্চবিদ্যালয়ে বেলা ৩টেয় একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল, ‘সভার মতে ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়।’ অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা সকলেই সাবলীলভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করে। যুক্তি, পাল্টা যুক্তির মধ্যে দিয়ে সভার পরিবেশ জীবন্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে বিচারকদের রায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র দিব্যেন্দু মণ্ডল ও দ্বিতীয় স্থানে থাকে নবম শ্রেণীর কৃষ্ণেন্দু অধিকারী। করতালি দিয়ে আমরাও তাদের উৎসাহিত করি। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে উপস্থিত বিচারকমণ্ডলী এই ধরনের বাস্তবধর্মী অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সকলের বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে, আমরা ছাত্ররাই পারি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে। আমাদের বিদ্যালয়ে এই জাতীয় অনুষ্ঠান আরও হোক, এটা আমাদের ইচ্ছা।

‘চাষে লাভ নেই’ — আলোচনা চাকদহ বিজ্ঞান সংস্থার উদ্যোগে

শমীক সরকার, চাকদহ, ১৪ জুলাই •

নদীয়া জেলার চাকদা–র তাঁতরা ১ নং এর বাসিন্দা যুবক সুপ্রিয় সিংহ রায় প্রায় ককিয়ে উঠে বললেন, এবার আমাদের এলাকায় কত যে ‘রাউন্ড আপ’ ব্যবহার হয়েছে ঘাস মারার জন্য, তার ঠিক নেই। রাউন্ড আপ একটা মারাত্মক কীটনাশক। নিড়ানির জন্য লোক না লাগিয়ে, নিজেরাও নিড়ানি না দিয়ে চাষিরা এই কীটনাশকটি দিয়ে এক লহমায় ঘাস মেরে ফেলছে। অথচ এই ওষুধটির জমি, ফসল এসবকিছুর ওপর প্রভাবই সুদূরপ্রসারী। সুপ্রিয় আরও জানালেন, তাদের গ্রামে মোট তিরিশ বিঘে জমিতে এবার জৈব পদ্ধতিতে দেশি ধানের চাষ হয়েছে। তিনি নিজে দশ বিঘে জমিতে লাগিয়েছেন কালোমুনিয়া, চাউলমনি, রাধাতিলক। যারা চায় জৈব পদ্ধতিতে চষা দেশি ধানের চাল খেতে, তারা সরাসরি সেখান থেকে কিনতে পারে। দাম একটু বেশি, ৬০ টাকা কেজি।

‘চাষে লাভ নেই’ শীর্ষক একটি আলোচনায় ছাত্রছাত্রী, বিজ্ঞানকর্মী এবং চাষীদের সাথে কথোপকথনের ঢঙে আলোচনা হচ্ছিল সার বিষ দিয়ে করা বাণিজ্যিক চাষ করে ডুবতে বসা চাষিসমাজকে নিয়ে। আলোচনা করছিলেন কৃষিবিজ্ঞানী অনুপম পাল। ১৪ জুলাই বিকেলে চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজনে চাকদা–র পুরাতন বাজারে ঘুগিয়া ভুবনমোহিনী উচ্চবিদ্যালয়ে এই আলোচনায় উঠে এল গ্রাম বাংলার মানুষের নিজেদের গ্রাম, নিজেদের বীজ বৈচিত্র্য, নিজেদের মাটির প্রতি অবহেলার কথা। অনুপমবাবু বারবার এখনকার শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেললেন, যা আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দিয়ে কেবল বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে শেখায়। তিনি নিজেদের বীজ–বৈচিত্র্যকে রক্ষা করার ডাক দিলেন। আর যারা চাষি নয়, তারাও নিজেদের বাড়িতে একটু খোলা জায়গায় সব্জি ফলাতে পারে। উপহার দিতে পারে গাছ। চাষের সঙ্কটমোচনে যথাসম্ভব স্থানীয় খাবার খাওয়ার কথাও উঠে এল। কথায় কথায় উঠল কিউবার খাদ্য স্বনির্ভরতার কথা। চাষিরা তো স্বরোজগেরে। প্রশ্ন উঠল, স্বরোজগারের বদলে চাকরির দিকে ঝোঁক কি বিবেচকের কাজ?

সভায় উপস্থিত এক কিশোর চাষি প্রশ্ন করল, দেশজ ধান কেরালাসুন্দরী চাষ করতে গিয়ে যদি মাজরা পোকা হয়, তাহলে আমি কি করব? উত্তরে অনুপমবাবু বললেন, ২–৩ বছর সময় লাগবে। রাসায়নিক সার বিষ দেওয়া কমিয়ে জৈব সার বিষ বাড়িয়ে বাড়িয়ে যেতে হবে। আস্তে আস্তে মাটির জৈব সত্ত্বা ফিরে এলে তারপর আর পোকা লাগবে না। ধৈর্যের প্রয়োজন।

আমাদের লাইনে প্রায়ই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে পেপারওয়ালাদের খোঁজ কেউ রাখে!

৮ জুলাই, ইন্দ্রজিৎ দাস, রবীন্দ্রনগর, মহেশতলা •

আমি যখন নুটবিহারী বয়েজ স্কুলে পড়তাম, বাঁধাবটতলায় মামাবাড়িতে থাকতাম। মাধ্যমিক দেওয়ার পর পাশ করতে না পেরে আমি পড়াশুনা ছেড়ে দিই। কাজকম্ম তো সেরকম পাওয়া যায় না, আস্তে আস্তে এই পেপার লাইনে ঢুকলাম। আমাদের মামাবাড়ির পাড়ায় পেপার দিত প্রদীপ। ২০০৪ সালে ওর থেকে লাইনটা কিনলাম, যত পেপার তার ওপর পেপার প্রতি একশো টাকা দিয়ে লাইন কিনতে হয়। রবীন্দ্রনগরের একশোটা পেপারের লাইন কিনেছিলাম। তখন থেকে ধর্মতলায় গিয়ে পেপার কিনে এখানে এসে ডিস্ট্রিবিউট করি। তারপর ঠাকুমার প্যারালাইসিস হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবা বাইরে থাকেন। তিনি পুনায় ছোটোখাটো একটা কাজ করেন। তখন ঘরে একজন ছেলে থাকা দরকার। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই আমি রোজ এখান থেকে লঞ্চঘাট পার হয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে বাড়ি চলে যেতাম। আবার ভোরবেলা চারটের সময় সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে এসপ্ল্যানেডে গিয়ে কাগজ কালেকশন করি। আকড়া ফটকে যখন এসে পৌঁছাই, তখন আটটা বাজে। রাত তিনটে থাকতে ঘুম থেকে উঠে পড়ি। দাঁত মেজে বাথরুম সেরে রুটি–টুটি খেয়ে তবে বেরোই। তারপর সব কাজ সারতে সারতে দুপুর একটা বেজে যায়। বাঁধাবটতলায় মামাবাড়িতে খেয়ে নিয়ে ঘরে ফিরি লিলুয়ায়। ফেরার সময় দেড়ঘন্টা লাগে। সকাল থেকে খাটার পর সন্ধেবেলায় আমি বসেই কাটাই। বাড়ির বাজারহাট সব মা সামলান।

এতদিন কাজ করার পর আমার লাইন বেড়েছে। কমা–বাড়া ধরে এখন আমার দেড়শো পেপারের লাইন আছে। গত বছরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, তারপর এবার হল। আমাদের এই রুটটায় পুলিশের হ্যারাসমেন্ট নেই, প্রচুর পেপারওয়ালা থাকে, তবে অন্য রুটে হয়। আমাদের মধ্যে কেউ রেড রোড ধরে, কেউ বাবুঘাট ধরে। আমাদের এই মেটিয়াবুরুজ রুটে কম করে খান–তিরিশেক

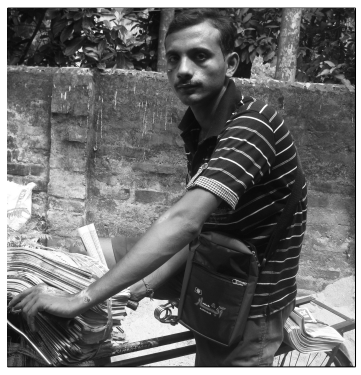

মোটরগাড়ির ধাক্কায় আহত ইন্দ্রজিৎ দাস আবার কাজে ফিরে এসেছে। ওর হাত, কনুই আর পিঠের ঘা এখনো শুকোয়নি। তবু জীবিকার তাগিদে ওকে আবার সাইকেল নিয়ে পথে নামতে হয়েছে। ছবি জিতেন নন্দী, ৮ জুলাই।

পেপারওয়ালা আছে। সবাই ধর্মতলায় যায় না। কেউ কেউ খিদিরপুর থেকে নেয়। এর আগে একজন চেষ্টা করেছিলেন যাতে পেপারগুলো রামনগরে চলে আসে। ধর্মতলায় যে ব্ল্যাকাররা আছে তাদের পেটে লাথি পড়বে বলে তখনকার সরকার সেটা করতে দেয়নি। কোম্পানি থেকে ব্ল্যাকাররা কাগজ তুলে নিল, তাদের থেকে আমরা নিয়ে আসি। তারা আমাদের কাছ থেকে পেপার পিছু দশ পয়সা করে কমিশন পায়। আমরা আবার চেষ্টা করছি যাতে পেপার রামনগরে আসে। এটা হলে কোম্পানি ধর্মতলায় না পাঠিয়ে এখানে পেপার পাঠাবে। তাতে আমাদের পরিশ্রম অনেকটাই কমে যাবে, রাস্তার রিস্কটাও কমে যাবে। আমাদের লাইনে প্রায়ই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। এমন অনেকে আছে, যারা কন্টেনারের ধাক্কায় মারা গেছে। পেপারওয়ালাদের খোঁজ কেউ রাখে! এখানে প্রচুর পেপার আসে। আমাদের মেডিক্লেম করা আছে। আমরা কিছুই পাই না। সব ওপরে খাওয়াখাওয়ি হয়ে যায়। পেপারে লিফলেট ভরে দিলে আমাদের জন্য একটা কমিশন আসে। এছাড়া, নতুন কাগজ চালু হওয়ার সময়ই আমাদের জন্য কিছু আসে। আমাদের হাতে কিছুই আসে না। সব ইউনিয়নের লোকেরা খেয়ে নেয়।

মাছেদের দুনিয়ায় মা বাচ্চাকে আগলে রাখে আর বাবা বাইরের শত্রুকে ধাওয়া করে

৭ জুলাই, প্রদীপ জানা, আলমপুর, মেটিয়াবুরুজ •

শোল মাছের মতো দেখতে শাল মাছ। তার আকারটা বড়ো হয় এবং তার গায়ে মাথার পর থেকে চক্র–চক্র কালো দাগ আছে। আমাদের পাশের বাড়িতে একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরে দেখেছি শাল মাছ এসেছে। শাল মাছ যে পুকুরে থাকে সেখানে চারা পোনা–টোনা থাকলে কিন্তু সর্বনাশ করে দেয়। খেয়ে নেয়। শাল মাছ কিন্তু সবাই খায় না। এখন অবশ্য শাল মাছ খুব উঁচুদরে বিক্রি হচ্ছে, তিনশো টাকা কেজি, হোটেলের ফিশফ্রাইতে চলে যাচ্ছে। ভেটকি মাছের দাম আরও বেশি।

এমনি বসে থাকি, কাজকর্ম তো এখন নেই। আড্ডা আর কতক্ষণ মারা যায়। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে দেখি পুকুরে শাল মাছটা ভাসছে। কটাদিন দেখি ও ঘুরছে ঘুরছে। হঠাৎ ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি যে ও বাচ্চা দিয়েছে। শাল মাছ যে ডিমগুলো ছাড়ে, সুতোর মতো লম্বা একটা পাইপ, তার মাঝখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ডিমের কীট থাকে। মাছটা যখন প্রসব করে, তখন। তারপরে ওই পাইপটা ফেটে যায়, বাচ্চাগুলো বেরোয়। বেরোনোর পরে ওইখানে একটা মাকড়সার জালের মতো অংশে জলের ওপর বাচ্চাগুলো ভেসে থাকে। এরকম শোল মাছ, ল্যাটা মাছ, শিঙি মাছকে আমি ফলো করে দেখেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত ডিমগুলো পূর্ণাঙ্গ হয়ে বাচ্চা না বেরোচ্ছে, একেবারে সূক্ষ্ম, যেন সেই জলের পোকার মতো, খালি চোখে দেখাই যায় না। দশ–পনেরো দিন পরে বাচ্চাগুলো বড়ো হলে ওদের নিয়ে মাছেরা খেলে। শাল, শোল, ল্যাটা সবই একই প্রক্রিয়ায় বাচ্চাদের বড়ো করে। কৈ মাছ একটু দূরে থাকে। বাচ্চাদের মাঝখানে রাখে, ওদের ঘিরে মেয়ে আর ছেলে থাকে। মা কোনো কারণে মারা গেল কিংবা কেউ ধরে নিয়েছে, নাহলে মেয়ে আর ছেলে মানে বাবা–মা দুজনই থাকে। মা বাচ্চাকে পাহারা দেয় আর বাবা শত্রুপক্ষ আসছে দেখলে তাদের ধাওয়া করে। মা সবসময় ছোটো, বাবা আকৃতিতে বড়ো। শাল, ল্যাটা এরা পরপর দুবার ডিম পাড়ে। এদের শরীরের ভিতর দুটো ডিমের ছড়ি থাকে। বড়ো লাইনটা আগে ডেলিভারি হয়, এক–দেড়মাস পর ছোটোটা ডেলিভারি হয়। বছরে দুবার ডিম দেয়।

মাছ ধরতে ধরতে এগুলো বোঝা যায়। শাল মাছটাকে যখনই আমি অ্যাটাক করতে যাই, মা–টা গালে করে বাচ্চাকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়, সেখানে নিয়ে ছেড়ে দেয়। ক–দিন ফলো করে করে ভাবলাম, না! ছেড়ে দিই, বাচ্চা আছে। মেরে দিলে বাচ্চারা অসহায়! যদি বাবা–মাকে ছিপ দিয়ে তুলে নিই বা মেরে দিই, এই বাচ্চাগুলো বাঁচবে না। ওদের যে শত্রুপক্ষ, কৈ ল্যাটা চ্যাঙ মাছ, বাচ্চাগুলোকে খেয়ে নেবে। অনেক বাড়িতে পুকুরে ল্যাটা বা শোল মাছের বাচ্চা থাকলে তারা মাছকে মারে না। যে জিনিসকে মারলে ভক্ষণ করা যায়, তাতে পাপ হয় না। বিনা কারণে মেরে ফেলে দেওয়া সবচেয়ে খারাপ। আমি এসব ভাবি। তবে সব যদি মায়া করে ছেড়ে দিই, আমি খাব কী? আমি একজন শিকারী, শিকার করতে গেছি। হাতের সামনে জলে মাছ ঘোরাঘুরি করছে, হাতে কোঁচ বা যন্ত্র আছে, না মেরে ঘরে চলে যাব, এমনটাও নয়।

অনেক সময় পুকুরে বাচ্চা আছে জানি না। অজান্তে বড়ো মাছ মেরে দিয়েছি। তেলাপিয়া, নাইলন–টিকা মাছের যখন ছোট্ট বাচ্চা থাকে, জলে ভাসছে, দেখতে পেল কোনো আঘাত আসছে, একটা সাপ আসছে, টুক করে মুখে নিয়ে অন্যত্র গিয়ে ছেড়ে দেয়। কারণ ছেড়ে না দিলে তারা বাইরের অক্সিজেন পাবে না। আমার কথাটা হল, মাছই শুধু নয়, প্রতিটা প্রাণী কীভাবে নিজের বাচ্চাদের লালন–পালন করে। মা বাচ্চাকে আগলে রাখে আর বাবা বাইরের শত্রুকে ধাওয়া করে। তবে একটা ল্যাটা মাছ তো আর শোল মাছকে তাড়া করতে পারে না। তাহলে সে ওর পেটেই চলে যাবে!

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 5 Issue 2 16 July 2013 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

নিমগ্রামে শবে বরাত

জিতেন নন্দী, মেটিয়াবুরুজ, ৫ জুলাই •

শবে বরাত মুসলমানদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। হিজরি সালের শাবান মাসের পঞ্চদশ রাতে এ অনুষ্ঠান পালিত হয়। শব অর্থ রাত আর বরাত হচ্ছে সৌভাগ্য। অর্থাৎ শবে বরাত মানে সৌভাগ্যের রজনী। লোকে ওইদিন হালুয়া-রুটি তৈরি করে প্রতিবেশী ও গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে। আরিফ শেখ, ওর ছোটোআব্বা ফিরোজ শেখ আর চাচাতো ভাই জানারুল শেখ কলকাতায় মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে রাজমিস্ত্রি আর জোগাড়ের কাজ করে। ওদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানায়। শবে বরাতের সময় ওরা এক সপ্তাহ বাড়িতে কাটিয়ে এল। আরিফ শেখের মুখে শুনলাম ওদের গ্রামে শবে বরাতের পরবের বিবরণ।

শবে বরাতের আগের দিন রাত সাড়ে দশটার সময় আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে কবিগুরু এক্সপ্রেস ধরি। রাত তিনটের সময় সাগরদিঘি স্টেশনে নেমে মোটর-ভ্যান ধরে পৌঁছালাম নবগ্রামে। সেখান থেকে হেঁটে আমাদের নিমগ্রামে ঢুকলাম, তখন ভোর চারটে। ঘরে শবে বরাতের রান্না শুরু হয় বিকেল চারটে নাগাদ। হালুয়া তৈরি হয় অনেকরকম। বাদামের হালুয়া, ডিমের হালুয়া, পোস্তর হালুয়া, পেঁপের হালুয়া, ছোলার হালুয়া, গুড়ের হালুয়া, সুজির হালুয়া আর চালের রুটি। রান্না খাবার প্রথমে ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করে খয়রাত করা হয়। ফকিররা আসে অন্য গ্রাম থেকে। আদিবাসীরাও আসে। নিমগ্রামের গরিবদের ঘরে আমরা খাবার নিয়ে যাই। সন্ধেবেলা আমরা যাই মাজারে বাতি জ্বালাতে। আমাদের গ্রামে দুটো মাজার, বড়োপীরের মাজার আর রহমানিপীরের মাজার। আমরা

শবে বরাতের বাজার, ছবি ইন্টারনেটে থেকে

দুটোতেই যাই। এরপরে যাই কবরে। আমরা দাদু আর মেজোআব্বার কবরে গিয়ে জিয়ারত করেছি। এরপর আমরা ঘরে এসে হালুয়া-রুটি খাই। মেটিয়াবুরুজে যেমন বাজি-পটকা ফাটানো হয়, গ্রামে সেরকম হয় না। তবে বাচ্চারা ছররা-কাঠি জ্বালায়। কেউ কেউ রাত জেগে আল্লার কাছে ইবাদত করে। ক-দিন বাড়িতে কাটিয়ে আমরা ফের মেটিয়াবুরুজে কাজে ফিরেছি।

বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী
শান্তিপুরের চায়ের আসর বন্ধ হয়ে গেল

অমিতাভ মিত্র, শান্তিপুর, নদিয়া, ২০ জুন •

চায়ের আসর বন্ধ হচ্ছে খবরটা অনেকদিন ধরেই শুনছিলাম। আজকাল প্রত্যুষদা আর প্রদ্যুৎদার শরীরটাও তেমন ভাল যাচ্ছিল না। দুজনার কারোরই একার পক্ষে একটানা চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু আচমকা যে সেদিনই বন্ধ হয়ে যাবে ভাবিনি। বিশেষ একটা কাজে কলকাতায় ছিলাম, বিকেলে পার্থবুড়োর ফোন — 'চায়ের আসর বন্ধ হয়ে গেল। আজ শেষবারের মতো সকলে চা খেয়ে গেল।' বলেই আমাকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কট্ করে ফোনটা কেটে দিল। পার্থ বুড়ো মানে আমার পার্থদা এমনই। কোনো কিছুতে ব্যথা পেলে বা আবেগকে আঘাত করলে পার্থদা সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবে। মনে পড়ল কয়েক মাস আগে বিকেলের কথাটাকে। তখন শান্তিপুর নিয়ে তথ্যচিত্রের কাজটা খুব মন দিয়ে করার চেষ্টা করছি, পার্থদার সাথে মতিগঞ্জে দেখা। বলল, 'আমার একটা কাজে হাত দিবি, শান্তিপুরের চায়ের আসর নিয়ে একটা কাজ করবি?'

তাৎক্ষণিকভাবে পার্থদাকে সম্মতিও দিয়েছিলাম। শুধু তাই নয় এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনার সঙ্গে দেখাও করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু কাজটা আর এগোয়নি। 'চায়ের আসর' নিয়ে কাজ করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে মনে হয়েছে, তার কারণ শান্তিপুরের 'চায়ের আসর' শুধুমাত্র একটা চায়ের দোকানই নয়, একটা প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই যে দোকানটার জন্ম সুদীর্ঘ এত বছর পর ২০১৩-র জুন মাসে তার বন্ধ হয়ে যাওয়া; এর ইতিহাস, এর নস্টালজিয়া, এর আবেগঘন মুহূর্ত স্মৃতিচারণে তুলে আনা বড়োই কঠিন কাজ।

১৯৪৭ সালে কালী মুখার্জি মাঠের সামনে তিনু চক্রবর্তীর হাত দিয়ে 'চায়ের আসর'-এর যাত্রা শুরু। তখন গুড়ের টিনের চারচালা ছিল। দেওয়ালটাও টিনের ছিল। ইঁটের দেওয়াল গাঁথা হয়েছিল ১৯৬৪-৬৫ সালে। এখন যেটা হরদার 'অঙ্গরাজ' বা তার পাশের 'রায় মেডিকেল' তখন ওখানে নিতাইদার 'বঙ্গশ্রী' কেবিন ছিল। বঙ্গশ্রী কেবিন শুরু হয়েছিল বিশ্বেশ্বর মুখার্জীর হাত ধরে। আবার তার পাশেই ছিল তাজ রতনের রেস্টুরেন্ট। অনেক পরে সেই রেস্টুরেন্ট-এর নামকরণ হয়েছিল 'আমাদের দোকান'। এসব দোকানগুলোতেও কিন্তু চা, পাঁউরুটি, মাংস, ঘুগনি সবই পাওয়া যেত। আবার সুশ্রী সিনেমার পাশে এখন যেটা 'পাল ডেকরেটার্স', তখন সেটা কাশীনাথ ভট্টাচার্যের চায়ের দোকান ছিল, এসব দোকানগুলোয় মানুষ এসে অর্ডার দিত, খেয়ে চলেও যেত। কিন্তু 'চায়ের আসর'-এ এসে চায়ের কাপেই তুফান তুলত। তাই 'চায়ের আসর' অনন্যই ছিল। সেই 'চায়ের আসর'-এ প্রত্যুষ এবং প্রদ্যুৎবাবুর দাদা গোবিন্দবাবু কর্মী ছিলেন, তার কয়েকবছর বাদে সেই গোবিন্দ বিশ্বাসের হাতে 'চায়ের আসর'-এর মালিকানা।

এসবই আমার প্রত্যুষদার মুখ থেকে শোনা। তার কারণ 'চায়ের আসর'-এর যখন জন্ম হয়েছে তার প্রায় ৩০ বছর পরে আমার জন্ম। আমার ছেলেবেলায় আমার বাবাকে, মাঝে মাঝে দেখতাম 'চায়ের আসর'-এ দাবা খেলতে, একটা চৌকো পারা ঘর, তাতে সার দিয়ে কয়েকটা চেয়ার টেবিল, অনেক লোক বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গল্প করছে, কেউ চা-খাচ্ছে, কেউ সিগারেট খাচ্ছে, কেউ বা দাবা খেলছে। বাবার কাছে শুনেছিলাম ওরা নাকি বুদ্ধিজীবী।

তো যাই হোক, ছেলেবেলায় 'চায়ের আসর' আমাকে বুদ্ধিজীবীদের ভয় দেখালেও কলেজ পড়ুয়ারা আমাকে কিন্তু সাদরে টেনে নিয়েছিল। কলেজের সামনে রতনদার চায়ের দোকান দুপুরে যেমন টানত, বিকেলে 'চায়ের

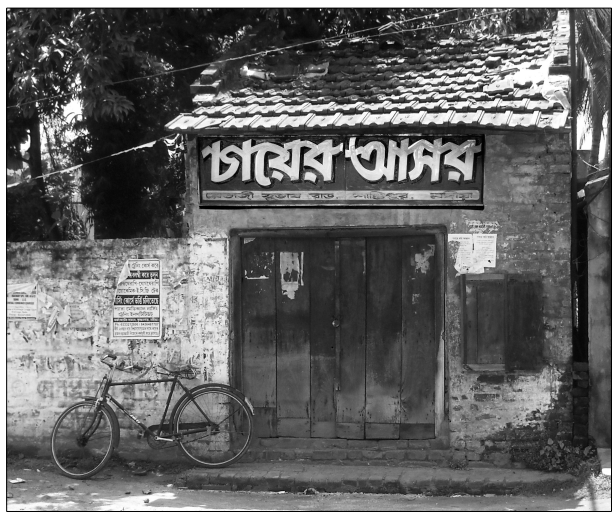

বন্ধ চায়ের আসরের ছবি প্রতিবেদকের তোলা

আসর'-ও সমানভাবেই আমাকে টানত, একটু আধটু কলেজ-রাজনীতি করতাম, কেরোসিন কিংবা বাসস্ট্যান্ড দিয়ে আন্দোলন টান্দোলনও একটু-আধটু করেছি। আলোচনার জায়গাটাই ছিল 'চায়ের আসর'-এ। অনেক বিখ্যাত লোকও নাকি এখানে মাঝে মাঝে আসতেন। বিবেক প্রেসিডেন্সিতে পড়ত, খুব বড়াই করে কফি হাউসের কথা বলত। বলত পাগড়ি পরা মানুষেরা নাকি কফি দেয়, আমি তাল ঠুকে বলতাম — 'রাখ তো তোর কফি হাউস, তুই তো এখন চায়ের আসরেই বসে আছিস।' কলকাতার কফি হাউস থাকতে পারে, আমিনিয়া থাকতে পারে, আরও অনেক কিছু থাকতে পারে, কিন্তু শান্তিপুরেরও একটা 'চায়ের আসর' আছে, মফস্বলে তুই এমন একটা দোকান দেখা তো সেখানে ছাত্র শিক্ষক একসাথে বসে চা খাচ্ছে। আমরা যারা বন্ধু মহলে নিজেদের মধ্যে একটু আদিরসাত্মক কথা আলোচনা করতাম সেই আমরাই 'চায়ের আসর'-এ গিয়ে বসলে বড়োদের অত্যন্ত সমীহ করতাম, তখন 'চায়ের আসর'-এ ডিম, মাংস, ঘুগনি, সবই পাওয়া যেত।

মনে পড়ছে আমাদের ছয় বন্ধুর সেই ঘটনাটা — ছ-জনে মিলে একটা ডিমের মামলেটের অর্ডার দিয়েছিলাম, আবার প্রত্যুষদাকে সেটা ছ-ভাগ করতে বলেছিলাম, যে প্রত্যুষদা এখন আমাকে বুকে জড়িয়ে স্নেহ করেন, তিনিই সেদিন আমাকে ঘুগনি মাখা হাতা নিয়ে তাড়া করেছিলেন। আরও একটা ঘটনা মনে পড়ে — গল্প করছি বন্ধুরা, সামনে রাখা গরম চা, গল্পে মশগুল হয়ে চা খাচ্ছি, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি চায়ে পিঁপড়ে বোঝাই। প্রত্যুষদাকে বলতেই প্রত্যুষদা বলল — 'ওগুলো চায়ের পাতা, খেয়ে নে।' এরকম অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা মালার মতো গাঁথা হয়ে আছে।

'সুশ্রী' সিনেমা হল আগেই বন্ধ হয়েছে, 'সুন্দরশ্রী'টাও ক-দিন আগে বন্ধ হল, এখন 'চায়ের আসর'টাও বন্ধ হয়ে গেল। শান্তিপুরের মানুষের মনে হয় আর কিছুই থাকল না। নেট দুনিয়ার জটিলতার আবর্তে যে মানুষগুলো গায়ে গা ঠেকিয়ে গন্ধ নিয়ে বাঁচতে চায়, উড়ো চিঠির হাতছানিতে না ভুলে একে অন্যের সম্পর্ককে বিশ্বাস করে তারা বোধহয় স্মৃতি আঁকড়েই বাতিল হয়ে গেল।

ব্রতচারী আন্দোলন নিয়ে তথ্যচিত্র দেখানো হল গুরুসদয় দত্তের জন্মদিনে

সুকুমার হোড় রায়, কলকাতা, ১ জুলাই •

আগা ডোম বাগা ডোম ঘোড়া ডোম সাজে। বীরভূমে রাঢ়ভূমির প্রান্তরে রণ পায়ে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে ডাকাতরা মহড়া করত 'রায় বেশে' নাচের মাধ্যমে। এই লুপ্তপ্রায় রায় বেশে নৃত্যকে গুরুসদয় দত্ত বীরভূমের জেলাশাসক হয়ে পুনরুদ্ধার করেন। ১৯২০ সালে স্ত্রী সরোজনলিনী ও পুত্র বীরেন্দ্র সদয়কে নিয়ে জাপানে গিয়ে দেখেন, জাপানি মহিলারা তাদের লোকনৃত্য, লোকসংস্কৃতি নিয়ে চর্চা ও অনুশীলনে মেতে থাকে সর্বদা। পরের বছর দেশে ফিরে তিনি বাঁকুড়ার জেলাশাসক হন। সেই সময় সরোজনলিনী দুঃস্থ মহিলাদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'নারীমঙ্গল কেন্দ্র'। উদ্দেশ্য ছিল, লেখাপড়া-স্বাক্ষরতার সাথে সাথে শরীরচর্চা, হস্তশিল্প শিক্ষার দ্বারা মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলা।

গুরুসদয় ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় জেলাশাসকের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করা, তাই নিয়ে লেখালেখি, লোকসঙ্গীতের সুরে গান লেখা — এসব কাজ করে চলেছিলেন। সমাজের অন্যান্য বর্গের মানুষদের পাশাপাশি নিম্নবর্গের মানুষদের একসাথে নিয়ে বৃক্ষ রোপন, বনসৃজন, সমবায়ভিত্তিক কৃষি, আগাছা উপড়ানো, আবর্জনা পরিষ্কার করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত ও পরিষ্কার রাখা, খেলাধূলো, শরীরচর্চা, হাতের কাজ, শিল্প ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি ১৬টি শিক্ষার দ্বারা স্বদেশি চেতনায় পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলার কাজে ব্রতী ছিলেন গুরুসদয়। ১৯৩১ সালে তিনি রুরাল হেরিটেজ রিভাইভ্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ সালে ঘোষণা করেন ব্রতচারী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা। এর দুবছর পর সোসাইটির নাম বদলে রাখলেন ব্রতচারী সমিতি। ১৯৪১ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান গুরুসদয়।

ব্রতচারী আন্দোলন এবং তার প্রতিষ্ঠাতাকে নিয়ে এক তথ্যচিত্র বানিয়েছেন মনোজিত অধিকারী। ১২ বছর সময় লেগেছে তাঁর এটি বানাতে। ২৫ জুন গুরুসদয় দত্তের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলকাতার নন্দনের ৩ নং প্রেক্ষাগৃহে তথ্যচিত্র 'ব্রতচারী' দেখানো হলো। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ব্রতচারী সমিতির প্রধান সচিব কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, সমিতির প্রাক্তন প্রধান নায়ক দিলীপ সর্বাধিকারী, বীরভূম থেকে আসা পুরুষানুক্রমে রায় বেশে নৃত্য শিল্পী শিবরাম প্রামাণিক প্রমুখ। ব্রতচারী শিক্ষাকে দুই বাংলাতেই বিদ্যালয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ ব রে দু নি য়া

ইতিহাসের বৃহত্তম জনবিক্ষোভের পর সেনার হাতে ফের জমানা পতন মিশরে

তামারুদ

আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি, কারণ এখনও মানুষের নিরাপত্তা ফিরে আসেনি।
আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি, কারণ এখনও বঞ্চিত মানুষদের জন্য কোনও বন্দোবস্ত হয়নি।
আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি, কারণ এখনও আমরা বাইরে হাত পাতছি ঋণ চেয়ে।
আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি, কারণ শহীদরা এখনও ন্যায়বিচার পায়নি।
আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি, কারণ আমি বা আমার দেশ, কারোরই কোনও সম্মান নেই।
আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি, কারণ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, আমরা ভিক্ষে করে বেঁচে আছি।
আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি, কারণ এখনও মিশর আমেরিকায় কথায় চলছে।

মোহাম্মদ মোরসির আগমনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মনে হচ্ছে, বিপ্লবী লক্ষ্যের কোনও কিছুই অর্জিত হয়নি। পাওয়া যায়নি সম্মানজনক জীবন, মুক্তি, সামাজিক ন্যায়, এবং জাতীয় স্বাধীনতা। ... তাই আমরা নিম্নের স্বাক্ষরকারীরা মিশরীয় নাগরিক হিসেবে মোরসির পদত্যাগ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন চাইছি। আমি বিপ্লবের লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে সম্মানজনক জীবন, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ অর্জনের জন্য কাজ করব।

কুশল বসু, কলকাতা, ১১ জুলাই •

বিপ্লব ফিরে এল মিশরের রাস্তায়।

মুবারক জমানা পরবর্তী মিশরের নয়া প্রেসিডেন্ট, ইসলামপন্থী মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক সংগঠনের মোহাম্মদ মোরসি প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষগুলির বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল ২২ নভেম্বর ২০১২ থেকেই। মুবারক জমানায় মানুষের ওপর উৎপীড়নকারী পুলিশ অফিসারদের মধ্যে অনেকেই খালাস পেয়ে গিয়েছিল, তাদের পুনর্বিচার এবং শাস্তি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি মোরসি। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

জানুয়ারি মাসে বিপ্লবের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিরোধীরা বিভিন্ন শহরে জমায়েত করে। মোরসির বাড়ির সামনে প্রচুর মানুষ জড়ো হয় তার উৎখাত চেয়ে। জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে একটি ফুটবল দাঙ্গার বিচারকে কেন্দ্র করে পোর্ট সইদ শহরে জনবিদ্রোহ হয়। চলতে থাকে পুলিশের অত্যাচার। কায়রো, পোর্ট সইদ, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য ছোটো বড়ো শহরে বিক্ষোভ হতে থাকে। মোরসির পার্টি মুসলিম ব্রাদারহুড এবং বিরোধীদের সংঘর্ষে এবং পুলিশি নিপীড়নে জানুয়ারি মাসে প্রায় পঞ্চাশ জনের মৃত্যু হয়। সারা মিশর জুড়ে পুলিশি সন্ত্রাস বাড়তে থাকে। রাজধানী শহর কায়রোতে মহিলাদের ওপর শাসকদল মুসলিম ব্রাদারহুডের ক্যাডারদের হামলা, এবং তাহরির স্কোয়ারে জমায়েত হওয়া প্রতিবাদী মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা বাড়তে থাকে। ৬ ফেব্রুয়ারি তাহরির স্কোয়ারে মহিলাদের ওপর যৌনহিংসার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয়। বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশি নিপীড়নের ছবি দেশের প্রধান বেসরকারি মিডিয়া প্রচার করলে বিরোধীদের বিক্ষোভের আগুন জনমানসেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুবারক জমানার পুলিশি অত্যাচারের স্মৃতি ফিরে আসে।

মার্চ মাসে বন্দর শহর পোর্ট সইদে ফের জনবিদ্রোহ হয়। ৩ মার্চ কয়েদিদের ছাড়াতে আসা জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে তিনজন পুলিশ এবং দু-জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়। পরে আরেকটি ঘটনায় রাজধানী কায়রোর তাহরির স্কোয়ারের কাছে তিনজন বিক্ষোভকারীকে গুলি করে মারে পুলিশ। মে মাসে প্যালেস্তাইনের নিকটবর্তী সিনাই প্রদেশে সশস্ত্র হামলা শুরু হয়। মিশরে মোরসির শাসন দুর্বল হতে থাকে, কিন্তু বিরোধীদের আন্দোলনও জমি পাচ্ছিল না। রাস্তায় নেমে প্রচুর প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও তা জনবিপ্লবের আকার নিচ্ছিল না।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে পাঁচজন আন্দোলনকারী 'তামারুদ' (আরবি ভাষায় এই শব্দের বাংলা মানে বিদ্রোহ) নামে একটি প্রচার শুরু করে। এদের মধ্যে অন্যতম একজন মাহমুদ বদর, যিনি মুবারক জমানার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বদায়ী 'কেফায়া আন্দোলন'-এর একজন সংগঠক, একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রযোজক এবং সাংবাদিক)। তামারুদ একটি সাধারণ সই সংগ্রহ অভিযান, মোরসির উৎখাত এবং নয়া প্রেসিডেন্সিয়াল ভোট চেয়ে। এক পাতার এই সই-সংগ্রহের বয়ানটি সঙ্গের ছবিতে দেওয়া হল।

এই প্রচারে স্বাক্ষরকারীদের ১৪ সংখ্যার জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বারও দিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। এই প্রচার কিছু বিপ্লবী কর্মী শুরু করলেও অচিরেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই প্রচারে জুড়ে যায়। এই সই-সংগ্রহ অভিযান ব্যাপক সাড়া পায়। ৩০ জুনের মধ্যে দেড় কোটি সই সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল, ওঠে ২ কোটির ওপরে সই। মোরসির মুসলিম ব্রাদারহুড পাল্টা সই সংগ্রহ শুরু করে, এবং দাবি করে, তারা এক কোটির ওপরে সই সংগ্রহ করেছে।

২৬ জুন সরকারি মিডিয়াতে মোরসি আড়াই ঘন্টা ধরে ভাষণ দেন। কিন্তু সেই ভাষণে বিরোধী দলগুলিকে হুমকি দেওয়া ছাড়া কার্যত কিছু না থাকায় বিরোধীরা একজোটে ৩০ জুন মোরসির সিংহাসনের আরোহনের এক বছর পূর্তির দিনেই জনবিক্ষোভের ডাক দেয়।

৩০ জুন কায়রো সহ ১৮টি শহরে বিক্ষোভ হয়। প্রায় সমস্ত বিরোধী শক্তি এই বিক্ষোভে যোগ দেয়। কারও মতে, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, আল মাহাল্লা প্রভৃতি শহরে মোট দেড় কোটি মানুষ ওইদিন রাস্তায় নেমেছিল। যদি তা সত্য হয়, তাহলে এটি ছিল মিশরের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো জনবিক্ষোভ। মুসলিম ব্রাদারহুডের অফিস ভাঙচুর হতে থাকে। জুলাই মাসের শুরুতে মোরসি-সমর্থকদের ওপর বন্দুক হামলা শুরু হয়। ৩ জুলাই মিশরের সেনাবাহিনী মোরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করে। নয়া সংবিধান বাতিল ঘোষণা করে এবং প্রধান বিচারপতি আদিল মনসুরকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে। মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থক ও নেতাদের গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনী। বেশ কিছু মোরসি সমর্থক নিহত হয়। ব্রাদারহুডের টিভি চ্যানেল বন্ধ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক টিভি আল জাজিরার সম্প্রচারও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আমেরিকা ও ইউরোপের বড়ো বড়ো দেশগুলি মিশরের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কেউই মোরসির উৎখাতে খুশি হয়নি।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর,
পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল
: manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi.